ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

বাংলাদেশে মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক পরিবর্তন: একটি পর্যালোচনা

*মোঃ কামরুজজামান সরকার

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম হলো মুণ্ডা। ভারত থেকে প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে বাংলাদেশে আগমন ঘটলেও তারা নিজস্ব রীতিনীতি ও সংস্কৃতি লালনের মাধ্যমে স্বকীয়ভাবে এদেশে বসবাস করছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে, দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা বিভাগে এবং সিলেট বিভাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুণ্ডা জনগোষ্ঠী বসবাস করে থাকে। কৃষিভিত্তিক মুণ্ডা সমাজে চাষাবাদের জমিজমার অভাবের মধ্যেও কঠোর পরিশ্রমী এই নৃগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক নানা উন্নয়ন সূচকে তাদের এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সুস্পষ্ট হলেও নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত এই জাতি তেমন কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে শিক্ষাহীনতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, সামাজিক বৈষম্য, সম্পদের অভাব অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে মুণ্ডাদের এগিয়ে নিয়ে মূল সামাজিক স্রোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে বাংলাদেশের মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা ও পরিবর্তনের ধারা আলোচিত হয়েছে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মুণ্ডা। সমতলে বসবাসরত একাধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাঁওতাল, ওঁরাও, তুরি, পাহাড়ি, মুণ্ডা, মাহাতো ইত্যাদি।[১] এসব জনগোষ্ঠী তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে অনেক বছর ধরেই সমতল অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। আবহমান কাল ধরে মুণ্ডারাও স্বকীয় সামাজিক কাঠামোয় নিজস্ব রীতিনীতি পালনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। মুণ্ডারা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়। মুণ্ডাদের একটি বড়ো অংশের বাস ভারতের ছোটোনাগপুরে। অতি দরিদ্রতার কারণে একসময় তাদের অনেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ আমলে তারা চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে আসাম অঞ্চলে আসে। বাংলাদেশে মুণ্ডাদের আগমন ও তাদের বসতি বিন্যাস সম্পর্কে লিখিত তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিকে জমিদারেরা তাদের নীলচাষ ও চা বাগানের সূচনা করার জন্য শ্রমিক হিসেবে মুণ্ডাদের নিয়ে আসে এবং গাছ কেটে জমি আবাদ করার কাজে লাগায়। এই জনগোষ্ঠী বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র এলাকাসহ দক্ষিণবঙ্গের সাতক্ষীরা ও সুন্দরবনের নিকটস্থ এলাকায় এবং সিলেটের চা বাগান সংলগ্ন এলাকাতে বসবাস করে। বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, খুলনা, সাতক্ষীরায় মুণ্ডারা বাস করে।[২] ভারতীয় উপমহাদেশে মুণ্ডাদেরকে আদি অধিবাসী বলা হয়। সে কারণে তাদের সংস্কৃতির মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় এবং

* আইবিএস ফেলো, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থসামাজিক পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে। এই পরিবর্তনের পরেও মুণ্ডারা তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো ধারণ করে চলেছে। বাংলাদেশের মুণ্ডাদের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই এ প্রবন্ধের অভিলক্ষ্য।

বাংলাদেশে মুণ্ডাদের আগমন ও বসতি বিন্যাস

বাংলাদেশে বসবাসরত মুণ্ডা নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে খুব বেশি লিখিত তথ্য নেই। তবে এখানে বসবাসরত প্রবীণ মুণ্ডাদের মতামত ও মৌখিক তথ্যের ভিত্তিতে মুণ্ডাদের বাংলাদেশে আগমনের সময়কালের আর্থসামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। মুণ্ডারা কঠোর পরিশ্রমী ও সাহসী হওয়ার জন্য তৎকালীন জমিদারেরা মুণ্ডাদের কৃষিকাজ তথা জঙ্গল কেটে আবাদ করার জন্য এবং লাঠিয়াল হিসেবে সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়ে এসেছিলেন।[৩] দক্ষিণবঙ্গের মুণ্ডারা সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিকাজ, বাঁধ তৈরি করে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করে চাষবাস ও জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করার জন্য এদেশে আসে। তৎকালীন জমিদারদের মুণ্ডাদের নিয়ে আসার কারণ মুণ্ডারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী এবং অনুগত। সেজন্য জমিদারগণ অল্প সময়ে বেশি কাজ করার জন্য তাদেরকে নিয়ে আসেন। তারা লেখাপড়া জানত না, শুধু পরিশ্রম করত এবং হাঁড়িয়া মদপান করত। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বা লেখাপড়ায় তেমন কোনো আগ্রহও তাদের ছিল না। তারা নিজেদের জীবনযাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি ও জীবজন্তু শিকার করত এবং ফলমূল খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। একপ্রকার মানবেতর জীবনযাপন করত সেখানকার মুণ্ডা জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশে অভিবাসনের পূর্বে মুণ্ডারা গভীর অরণ্যঘেরা রাজমহালের পাহাড়, ছোটোনাগপুর, পালামৌ, দামন-ই-কোহ তথা মুণ্ডা পরগনার দুর্গম স্থানে বসবাস করত। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় রেলপথ স্থাপন, সড়ক নির্মাণ, জমিচাষ প্রভৃতি কাজের জন্য তারা দলবেঁধে বাংলায় আসতে থাকে। রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর অঞ্চলের বড়ো বড়ো ভূস্বামী জমিদারগণ বনজঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিজমি উদ্ধারের কাজে মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে মুণ্ডাদের এদেশে নিয়ে আসতেন। এসব শ্রমিকদের অনেকেই তাদের মূল বাসস্থানে ফিরে গেলেও কিছু লোক আস্তে আস্তে এখানেই বসতি গড়ে তোলে। বরেন্দ্রভূমিতে অভিবাসীদের সর্বশেষ ও ক্ষীণতম জনস্রোতটি এসে পৌঁছায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে।[৪] ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে মুণ্ডারা রাজশাহী জেলার আদিবাসী হিসেবে নথিভুক্ত হয়।

মুণ্ডা বিদ্রোহ উনিশ শতকে সংঘটিত উপমহাদেশের অন্যতম আদিবাসী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নাম ছিল 'উলগুলান' যার অর্থ প্রবল বিক্ষোভ। বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল মুণ্ডা রাজ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। রাঁচির দক্ষিণাঞ্চলে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুণ্ডা গণসংগ্রাম শুরু হয়।[৫] মুণ্ডা বিদ্রোহের সময় যেসব জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে তাদের মধ্যে মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীও অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে মুণ্ডাদের আগমন ঘটেছে ভারতের

ছোটোনাগপুর, আসাম, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে। মুণ্ডাদের আগমনের আরেকটি অন্যতম কারণ ছিল নীলচাষ। নীলচাষ ছিল অনেক কষ্টকর কাজ এবং অনেকেই এ কাজে অনীহা প্রকাশ করত। ব্রিটিশ শাসকগণ এবং জমিদারগণ জোর করে বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মুণ্ডাদের নীলচাষে বাধ্য করত। সবসময় তাদের নানা ধরনের কাজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হতো এবং হাঁড়িয়া মদ পান করিয়ে মাতাল করে রাখা হতো। বাংলাদেশে এভাবেই মুণ্ডারা অধিকারহীন এক ব্যবস্থাপনায় বসবাস করে সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

মুণ্ডাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও পরিবর্তনের ধারা

উত্তরবঙ্গের মুণ্ডা জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশে বসবাসরত মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মুণ্ডাদের সংখ্যা ছিল ২,১৩২ জন। দেশের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসরত মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৩ লক্ষ।[৬] তবে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারিতে এ চিত্র চোখে পড়ে না। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মাত্র ৩৮,২১২ জন।[৭] দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী শুধু বৃহত্তর সিলেট জেলার ১৪টি উপজেলাতেই ৪০ হাজার মুণ্ডার বসবাস।[৮] বরেন্দ্র অঞ্চলের মুণ্ডাগণ গোত্র বিভাজনের মতো মুণ্ডা ও পাহান এই দুটি ভাগে বিভক্ত। এ অঞ্চলের সবকয়টি জেলায় কমবেশি মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। সমতলের জেলাগুলোর মধ্যে নওগাঁয় সবচেয়ে বেশি মুণ্ডা বসবাস করে।[৯] নওগাঁর মহাদেবপুর, ধামইরহাট, মান্দা, বদলগাছী, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর ও পোরশা উপজেলায় বহু মুণ্ডা বসতি রয়েছে।

উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত মুণ্ডাদের প্রধানতম পেশা কৃষিকাজ। তারা অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। রাজশাহী ও নওগাঁ জেলায় বসবাসরত মুণ্ডাদের মধ্যে কৃষিজমি নেই বললেই চলে। খুব অল্পসংখ্যক মুণ্ডা পরিবারের চাষাবাদের নিজস্ব জমি রয়েছে। অনেকেই অন্যের জমিতে বর্গাচাষের মাধ্যমে চাষাবাদ করে থাকে। এছাড়া কিছু পরিবার জমি বন্ধক নিয়ে সেখানে চাষাবাদ করে থাকে। এই জমির পরিমাণও খুবই সামান্য। সে কারণে তারা অর্থনৈতিকভাবে এখনো তেমন স্বাবলম্বী নয়। পূর্বে তাদের কিছু পরিমাণ জমি থাকলেও তা বিভিন্ন কারণে হাতছাড়া হয়ে গেছে। ভূমিদস্যুরা অনেকে দখল নিয়েছে, কেউ কেউ অল্প দামে বিক্রি করে দিয়েছেন, কেউবা প্রতারণার শিকার হয়ে চাষবাসের জমি হারিয়েছেন। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পরিবারের নারী ও পুরুষরা প্রতিদিনই দলবেঁধে মাঠে কাজে যায়। সাধারণত সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা জমিতে কাজ করে। নারীরা খানিকটা দেরি করে মাঠে যাওয়ার কারণে পুরুষদের চেয়ে মজুরি কম পায়। এ অঞ্চলে বসবাসরত মুণ্ডাদের পূর্বপুরুষগণ বাংলাদেশে স্থায়ী হবার পর কৃষিকাজের সাথেই জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে অন্য পেশার লোকজন খুঁজে পাওয়া যেত না। তবে এখন কিছু সংখ্যক মুণ্ডা কৃষিকাজের বাইরে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। এসবের মধ্যে গাড়িচালক, বেসরকারি চাকরি, ব্যবসার সাথে অনেকেই জড়িত। মুণ্ডাদের কর্মক্ষম পুরুষদের অনেকে কৃষিকাজের বাইরে কুলি-মজুর, গোডাউন শ্রমিক, ভ্যানচালক হিসেবেও কাজ করে থাকে। তবে এ সংখ্যাটি একেবারেই

অপ্রতুল। বর্তমানে অধিকাংশ মুণ্ডা পরিবার ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ পরিবারের শুধু বসতভিটা ছাড়া চাষাবাদের জন্য নিজস্ব কোনো জমি নেই। এছাড়া অনেক পরিবার আত্মীয়স্বজনদের জমিতে ঘর তুলে বসবাস করছে। অনেক পরিবার সরকারি খাস জমিতে বসবাস করছে। মুণ্ডারা মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। শ্রমিকের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে তারা দলে দলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খণ্ডকালীন শ্রমিক হিসেবেও কাজ করে থাকে।[১০]

অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যেও মুণ্ডাদের এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ লক্ষ করা যায়। কাজের পাশাপাশি তারা গৃহে গবাদি পশুপালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করতে দেখা যায়। এনজিও থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে তারা বর্গা নেওয়া জমিতে চাষাবাদ করে থাকে এবং গোরু-ছাগল পালন করে থাকে। দৈনন্দিন আয় থেকে এনজিও'র কিস্তি পরিশোধ করে থাকে। এভাবে বছরে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করে থাকে। বিয়েসহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান জাঁকজমকভাবে পালন করতে গিয়ে মুণ্ডাদের অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। সে কারণে তাদের পক্ষে খুব বেশি সঞ্চয় করা সম্ভবও হয় না। তবে এত সমস্যার মধ্যেও তারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করে থাকে। মুণ্ডাদের পূর্বপুরুষগণ তেমন সঞ্চয়ী ছিলেন না। তারা যে যৎসামান্য আয় করতেন তা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করাই কষ্টসাধ্য ছিল তাদের নিকট। সে কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে মুণ্ডারা তেমন কিছু পায়নি। ব্যবসা করার জন্য যে মূলধন লাগে সেটাও তাদের নেই। তবে কয়েকটি অঞ্চলের অল্প কয়েকজন সরকারি চাকরিতে যোগদান করেছে। কিছু তরুণ বেসরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ করেছে। এভাবেই তারা ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুণ্ডা সমাজে শিক্ষার হার খুবই কম। শতকরা মাত্র আট থেকে দশজনকে শিক্ষিত হিসেবে গণ্য করা যায়।[১১] অর্থনৈতিক কারণে মুণ্ডা পিতামাতা শৈশবেই নিজ সন্তানদেরকে পারিবারিক উপার্জনের জন্য কাজকর্মে নিয়োজিত করেন। ফলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তবে বর্তমান সময়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা যদিও কিছুটা বেড়েছে, তবুও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর অনেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হতে পারে না। মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা মুণ্ডারি। তবে বাংলাদেশে বসবাসরত মুণ্ডাদের মুণ্ডারি ভাষা না জানার সংখ্যা ৯৫ শতাংশ।[১২] বেশির ভাগ মুণ্ডা সাদরি ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে থাকে। নিজস্ব ভাষা শিক্ষার সুযোগও তাদের নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে নিজস্ব বর্ণমালায় কোনো পাঠ্যপুস্তক না থাকা, পারিবারিক আর্থিক দুরবস্থা, জাতিগত নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি কারণে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর হয়ে আছে।

মুণ্ডা সমাজে নারী শিক্ষার হারও হতাশাব্যঞ্জক। তারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। উচ্চশিক্ষার অভাবে নারীরা চাকরি ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারছে না। মুণ্ডারা যদিও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে বসবাস করে তথাপি মুণ্ডা সমাজে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামত নেওয়া হয়।[১৩] মুণ্ডা সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের তেমন সুযোগ এখনো গড়ে ওঠেনি। নিজ সমাজের ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতা কাঠামোতে নারীদের তেমন অংশগ্রহণ নেই। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের ইচ্ছা ও ধারণায় গড়া সমাজের সাথে নারীদের খাপ খাইয়ে চলতে হয়। নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার কিছুটা বেড়েছে এখন। পূর্বে

নারীদের অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়া হতো। তবে এখন অনেক পরিবারে আঠারো বছরের আগে বিয়ে দেওয়া হয় না। বেশির ভাগ মেয়েরাই মাধ্যমিক পাশ করার পর আর পড়ালেখার তেমন সুযোগ পায় না। এক্ষেত্রে পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কাই প্রধান কারণ। তারা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। এসবের বাইরে কিছু মেয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে এ সংখ্যা সীমিত। পড়াশোনা করে চাকরির নিশ্চয়তা না থাকাটাও শিক্ষা বিমুখতার একটা অন্যতম কারণ। নারীদের কেউ কেউ কৃষিশ্রমিক হিসেবে নিয়মিত কাজ করে। অনেক গৃহিণী পারিবারিক অর্থের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করে।[১৪] পূর্বে নারীরা হাটবাজারে যেত না। তবে এখন সংসারের নানা কেনাকাটার জন্য তারা হাটবাজারে গমন করে। মুণ্ডা সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় এর শিকারও হয় তারা। তাছাড়া বিবাহের সময় পণ বা যৌতুক প্রথারও প্রচলন রয়েছে মুণ্ডা সমাজে। মুণ্ডাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃপ্রধান। পিতার মৃত্যুর পর তার সকল সম্পত্তির মালিক হয় পুত্রসন্তানরা। মেয়েরা পিতার সম্পত্তির কিছুই পায় না। তবে পিতা মৃত্যুর পূর্বে যদি তার কন্যাসন্তানদের কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে পুত্রসন্তানরা বোনকে সে অংশ দিয়ে থাকে। পরিবারে যদি কোনো অবিবাহিত মেয়ে থাকে, তাহলে পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির একটি অংশ তার নামে রাখা হয়। তবে বোনকে বিয়ে দিতে পারলে সেই সম্পত্তি আবার ভাইয়েরা নিয়ে নিতে পারে।[১৫]

মুণ্ডারা স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও অনেক পিছিয়ে রয়েছে বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অবস্থা খুবই নাজুক। পুষ্টিহীনতার কারণে মুণ্ডা নারী ও শিশুরা শারীরিকভাবে দুর্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী এবং প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য নাজুক অবস্থায় থাকে। কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই বললেই চলে। তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলনও আছে। মুণ্ডারা অসুস্থ হলে পূর্বে কবিরাজের সাহায্য নিলেও বর্তমানে ডাক্তারের চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বয়স্ক নারীরা সীমিত সচেতন হলেও বর্তমান প্রজন্মের বিবাহিত নারীরা বেশ সচেতন। আগে প্রায় বেশিরভাগ পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল না। এখন অনেক পরিবারের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যকর হলেও অস্বাস্থ্যকর অবস্থাও বিদ্যমান।

একসময় মুণ্ডাদের প্রায় সকল পরিবার যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল। তবে এখন সে অবস্থা আর নেই। খুব কম পরিবার যৌথ পরিবারে বসবাস করে। সাধারণত মুণ্ডা ছেলেরা বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে একক পরিবারে বসবাস করে।[১৬] ছেলেদের বিয়ে হওয়ার পর সাধারণত এক বা দুই বছরের মধ্যে তারা আলাদা একক পরিবারে বিভক্ত হয়ে যায়। এতে করে বৃদ্ধ বয়সে অনেকটা অসহায় অবস্থায় পড়তে হয় প্রবীণ মুণ্ডাদের। মুণ্ডাদের বসবাসের ঘরবাড়ি অতি সাধারণ হয়ে থাকে। সাধারণত মাটির ঘরে তারা বসবাস করে থাকে। মাটির ঘরে টিনের চালা দিয়েই বেশির ভাগ মুণ্ডা বাড়িঘর তৈরি করে থাকে। এসব ঘরে জানালা থাকে একেবারে উঁচুতে। জানালায় কয়েকটি বাঁশের খুঁটি থাকে। এসব অঞ্চলে মুণ্ডাদের পাকা ও আধা-পাকা ঘর খুব কমই চোখে পড়ে। অনেকে টিনের তৈরি ঘরে বসবাস করে। ঘরে বড়ো দরজা থাকে। বাড়ির উঠানে রান্নাঘর থাকে। এসব রান্নাঘরে কেবল খড়ের চালা থাকে। মুণ্ডাদের পূর্বপুরুষদের বাড়িঘর মাটির তৈরি হতো। চালায় থাকত খড়ের ছাউনি। এসব ঘরে জানালা থাকত না।

থাকলে তা খুব উঁচুতে থাকত। দরজা থাকলেও তাতে দরজা লাগানো থাকত না। কাজে যাওয়ার সময় দরজায় তারা কাঁটা বিছিয়ে দিয়ে যেত। তাদের ঘরে আসবাসপত্র বলতে কিছুই ছিল না। তৈজসপত্র বলতে ছিল শুধু মাটির হাঁড়িপাতিল আর টিনের বা কাঁসার থালা। মাটিতে খেজুরপাটি বিছিয়ে তারা জীবনযাপন করত। তীব্র শীতের সময় পরিধানের জন্য তেমন কোনো গরম কাপড় তাদের ছিল না। এমনকি গায়ে দেওয়ার জন্য লেপকাঁথাও ছিল না। তারা খেজুরপাটিতে শুয়ে তারই একটি প্রান্ত গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করত। একটুকরা কাপড় পরে তাই শরীরে পেঁচিয়ে ব্যবহার করত মুণ্ডা পুরুষরা। নারীরা শাড়ি বা বড়ো গামছা পরিধান করত। ব্লাউজ বা পেটিকোট কেনার সামর্থ্য ছিল না অনেকের। মুণ্ডা নারীদের নিজস্ব পোশাকের ওপরের অংশ পারিয়া এবং নিচের অংশকে লেহেঙ্গা বলে। এরা পারিয়া কোমরে বেঁধে বুকে শাড়ির মতো ভাঁজ করে পরিধান করে। আর পুরুষরা হাতকা নামের ৫-৬ হাত লম্বা পোশাক পরত। কিন্তু মুণ্ডাদের এই আদি পোশাকটি এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে মুণ্ডা ছেলেরা লুঙ্গি, শার্ট, প্যান্ট, ধুতি, পাঞ্জাবি পরিধান করে। নারীরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট পরে থাকে। মুণ্ডা নারীদের পছন্দের অলংকারের মধ্যে রুপার বালা, বাজু, চুড়ি, দুল, নাকফুল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে নারীরা এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের গহনা বেশি পরে।[১৭] এখন প্রায় সব ধরনের আসবাবপত্র আর তৈজসপত্র প্রতিটি বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়। চেয়ার, টেবিল থেকে শুরু করে খাট ,আলমারি প্রায় প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে। তৈজসপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এসেছে বৈচিত্র্য।

চাষাবাদ আর শিকার মুণ্ডাদের ঐতিহ্যগত জীবিকা। মুণ্ডাদের পূর্বপুরুষেরা ঐতিহ্যগতভাবে শিকারি ছিলেন। তারা বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি ও মাছ শিকার করতেন। তবে বন্যপ্রাণী শিকারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তারা ভুলতে বসেছে প্রাচীনতম সেই অভ্যাস। বর্তমানে তারা চাষাবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। নারী-পুরুষ উভয়েই কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে। তবে এখনো অনেক সময় মুণ্ডাদের দলবেঁধে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ছোটো ছোটো জীবজন্তু শিকার করতে দেখা যায়। মুণ্ডাদের খাদ্যাভ্যাস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তারা আমিষভোজী এবং তাদের প্রধান খাদ্য ভাত হলেও মাছ, মাংস, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আহার করে থাকে। নানা পালা-পার্বণ ছাড়াও মুণ্ডাদের মাঝে মদপান জীবনাচারের অংশ।[১৮] উত্তরাঞ্চলের মুণ্ডারা খাদ্যাভ্যাসের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। শামুক, ইঁদুর, শূকর, কাঁকড়া, কচ্ছপ, খাটাশ, বেজি, বনবিড়াল ও কুঁচে খায় বলে মুণ্ডাদের ছেলেমেয়েদের সাথে সাধারণ ছেলেমেয়েরা মিশতে চায় না।[১৯] সুশীল সমাজের মানুষেরা একসময় মুণ্ডাদের বুনো, কুলি বা সরদার বলে ডাকতো যা এখনো বিদ্যমান। বুনো বা কুলি শব্দটি অসম্মানজনক হলেও অন্যান্য সমাজে এখনো এই নামটি বেশ পরিচিত। মুণ্ডাদের পূর্বপুরুষেরা বনে থাকার কারণে তাদের বুনো নামে ডাকা হয়। মুণ্ডা সমাজের প্রবীণদের মতে, ৫০-৬০ বছর আগেও তারা পশুপাখির মাংস এবং মাছ রান্নায় মসলার ব্যবহার করেনি। বাঙালিদের মতো তারা রান্নাবান্না জানত না এবং ওইসব মাছ-মাংস কোনোরকম আগুনে সেদ্ধ করে খেতো বলে তাদের নাম হয়েছে বুনো।[২০] মুণ্ডাদের এরকম বুনো নামে ডাকা ছাড়াও তাদের সাথে সামাজিকভাবে আরো অনেক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। ফলে মুণ্ডারা একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এবং যথেষ্ট পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এদেশে আগমনের সময় তাদের যেরকম আর্থসামাজিক অবস্থা ছিল বর্তমানে অনেকের অবস্থা সেরকমই

রয়ে গেছে। এ অঞ্চলে বসবাসরত মুণ্ডারা সরকার প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের সুবিধাসমূহ থেকে অধিকাংশ সময় বঞ্চিত হয়। মূল সমাজ কর্তৃক অনেক সময় পারিবারিকভাবে এবং সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয় তাদের। হোটেলে খাওয়াদাওয়া করতে গেলেও অনেক সময় তাদের জন্য আলাদা থালাবাসন থাকে। তবে এসব বৈষম্য কিছুটা কমে এসেছে। এভাবে মুণ্ডা জনগোষ্ঠী বঞ্চনা ও বৈষম্যের কারণে সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন বা পরিবর্তন করতে পারেনি।

মুণ্ডারা বেশ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত হলেও মুণ্ডাদের মধ্যে কোনো শ্রেণিবিভাজন নেই। দেশের পূর্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত মুণ্ডারা পূর্বপুরুষের প্রথা অনুসরণ করে। মুণ্ডা সমাজের ক্ষমতা কাঠামোয় মোড়ল বা মণ্ডলের ভূমিকা রয়েছে। সমাজের কেউ কোনো অপরাধ করলে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুসারে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন মোড়ল। সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে অপরাধীকে বা তার পরিবারকে একঘরে করে রাখা হয়। গ্রামের মাতব্বর ও তার সহযোগীদের খাওয়ানোর দায়িত্ব পড়ে অপরাধীর ওপর। মুণ্ডারা একসময় রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল না। শুধু ভোট দেওয়ার মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থাকত। এখন অনেকেই নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে থাকে। নির্বাচিত হয়ে অনেকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। পূর্বে এসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও এখন তারা রাজনৈতিকভাবে অনেকটা সচেতন।

দক্ষিণাঞ্চলের মুণ্ডা জনগোষ্ঠী

দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন কয়রা, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা প্রভৃতি স্থানে মুণ্ডাদের বসবাস রয়েছে। এখানে বসবাসরত মুণ্ডারা মূলত কৃষিজীবী। মাছ ধরতে ও বনে গিয়ে মধু সংগ্রহে খুব কমই যায় তারা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষিজমি কমে যাওয়ায় বর্তমানে এই অঞ্চলের মুণ্ডাদের পেশাতেও পরিবর্তন এসেছে। অনেকেই কৃষিকাজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে ইটভাঁটা শ্রমিকের কাজে যোগ দিয়েছেন। অনেকেই জমি-ভিটে বেচে এলাকা ছেড়েছেন, হয়েছেন দেশান্তরী। এই অঞ্চলে একসময় মুণ্ডাদের প্রায় পরিবারেরই পর্যাপ্ত জমি ছিল। কিন্তু প্রভাবশালীরা ছলচাতুরী করে সেসব জমি দখলে নিয়েছেন। অনেকে অভাবের কারণে জমি বেচে দিয়েছেন। এখন অধিকাংশ মুণ্ডা পরিবারই হয় ভূমিহীন অথবা শুধু মাথাগোঁজার মতো বসতির অধিকারী। এখন অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করেই তারা জীবিকানির্বাহ করেন। মাঠে এই কাজের সুযোগ মেলে বছরে পাঁচ-ছয় মাস। বাকি সময় তারা বলতে গেলে বেকার থাকে। সেকারণে জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জীবিকার সন্ধানে নামছে মুণ্ডারা। ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন অসংখ্য মুণ্ডা। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ নারী মাঠের কাজে ব্যস্ত থাকে। বাড়ির পুরুষরা কয়েক মাসের জন্য চুক্তিতে ইটভাটার কাজে যায়। ইটভাটার কাজ থাকলে মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম ২০-৩০ হাজার টাকা নেয় মুণ্ডারা। পরে ভাটার মৌসুমে পাঁচ-ছয় মাসের জন্য শ্রমিক হিসেবে কাজ করে তা পরিশোধ করেন। ভাঁটার মৌসুম শুরুর আগে প্রায় এক মাস ধরে প্রতিদিন বাস ভরে শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছুটে যায় ইট বানানোর কাজ করতে। এখানকার অধিকাংশ মুণ্ডাদের গৃহই কাঁচা। মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরে তাদের বসবাস। ঘরের ভেতর সাপ, ইঁদুর আর তেলাপোকার উৎপাত তাদের নিত্যদিনের সাথি। মুণ্ডারা যে সকল গ্রামে বাস

করে সেখানে শুধু নোনাজল রয়েছে। পানীয় জলের মারাত্মক অভাব রয়েছে সেখানে। অনেক দূর থেকে মুণ্ডা নারীদের খাবার পানি আনতে হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থারও অভাব রয়েছে এই অঞ্চলে।

দক্ষিণাঞ্চলের মুণ্ডাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পড়াশোনায় অংশগ্রহণ বেশি। অধিকাংশ মুণ্ডা ছেলেমেয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে। ১২ বছর বয়স হলেই শিশুরা বাবার সাথে সংসারের হাল ধরে থাকে।[২১] এখানে সচেতনতার অভাবে শিক্ষার প্রসার কম। মনে করা হয়, পড়ার চেয়ে মাঠে কাজ করলে রোজগার বেশি হবে। এছাড়া পরিবারের বড়ো সদস্যরা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকায় সন্তানদের পড়াশোনার খোঁজ নেওয়ার কেউ থাকে না। তারা ঠিকমতো বিদ্যালয়েও যায় না। পিতা-মাতা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকলে সন্তানেরা বাড়িতে থাকা গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি দেখাশোনা করে থাকে। শিক্ষার হার কম হওয়ায় বিচিত্রমুখী পেশায় মুণ্ডাদের অংশগ্রহণ কম। অনেক মুণ্ডা পরিবারে কিছু জমি থাকলেও তাতে ধান ছাড়া অন্য ফসল হয় না। এমনকি ভিটার জমিতে শাকসবজি ফলানোও কষ্টকর। কারণ সেচের পানি মেলে না। তাদের পক্ষে গবাদি পশুপালন করাও মুশকিল। কারণ পশুকে খাওয়ানোর মতো ঘাস নেই। তাছাড়া পানির অভাবও প্রচণ্ড। আইলা ও সিডরের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে। অনেকে সপরিবারে অন্যত্র চলে গেছে। মুণ্ডাদের জীবন-জীবিকার এমন দুর্দশায়ও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য-সহযোগিতা মিললেও জীবনের টেকসই উন্নয়নের জন্য কেউ সেভাবে এগিয়ে আসছে না। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে হাতেগোনা কয়েকজন বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা পান। ভূমিহীন হওয়ার কারণে এনজিও থেকে ঋণ পেতেও তাদের সমস্যা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের মুণ্ডাদের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, জীবিকা, পানি ও শিক্ষার সুযোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষিভিত্তিক কাজে অভ্যস্ত মুণ্ডাদের সে সুযোগও কমে আসছে। সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থার (সামস) দেওয়া তথ্যমতে, বর্তমানে শ্যামনগরে মুণ্ডাদের ৪২০টি পরিবারের জনসংখ্যা ২ হাজার ৭৪০। এসব পরিবারের ৯৫ শতাংশ ভূমিহীন। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অভাবকে পুঁজি করে ভূমিদস্যুরা তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। বর্তমানে চার শতাধিক পরিবারের মধ্যে তিনজন গ্রাম পুলিশ এবং ১৩ জন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। অন্য সদস্যরা দিনমজুরের কাজ করেন।[২২]

সিলেটের মুণ্ডা জনগোষ্ঠী

সিলেট বিভাগের চা-জনগোষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম হলো মুণ্ডা। স্বল্প মজুরি, ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবার অভাব ও মাতৃত্বকালীন সেবার অপ্রতুলতায় পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এসব চা-শ্রমিক পরিবারের সদস্য। এর প্রভাব বেশি পড়ছে শিশুদের ওপর। খর্ব ও শীর্ণকায় হয়ে বেড়ে উঠছে তারা। পারিবারিক অভাবের কারণে মুণ্ডা শিশুদের অল্পবয়সেই চা বাগানে কাজে যোগ দিতে হয়। সাধারণত ছেলে শিশু শ্রমিকরা চা-বাগান পরিষ্কার করে এবং চা গাছের যত্ন নেয়। মেয়ে শিশু শ্রমিকরা চা-পাতা তোলে। কখনো কখনো মেয়ে শিশুদের বস্তায় চা রাখার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। চা-মৌসুমে শিশুশ্রমের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়। শ্রমিকরা চা-পাতা তোলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে শিশুদের কাজে লাগায়। দারিদ্র্যের কারণে চা-শ্রমিকদের অনেকেই বাগানে

শিশুদের নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবেই শিশুরা মূলত পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে জড়িত হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় মুণ্ডাদের বসবাস রয়েছে। সেখানেও তাদের অবস্থা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মুণ্ডাদের মতোই।

মুণ্ডাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সংগঠন

বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে মুণ্ডা সমাজের সামাজিক গতিশীলতা অনেক স্থবির। একসময় যৌথ পরিবারে বসবাস করলেও মুণ্ডা সমাজের জনসংখ্যার হার অনেক কম। বর্তমানে মুণ্ডা সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যৌথ পরিবার ভেঙে এখন একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে মুণ্ডা সমাজের উন্নয়ন আশানুরূপ হচ্ছে না এবং পরিবর্তনও আসছে না। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সমাজব্যবস্থাও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মুণ্ডা সমাজের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব, নেতৃত্বহীনতা, বাল্যবিবাহ, নারী শিক্ষার প্রচলন কম থাকা, সমাজে প্রচলিত হাঁড়িয়া মদের প্রসার ইত্যাদি। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অধিকার নিয়ে কথা বলার সুযোগ একসময় কম থাকলেও এখন অনেক সংগঠন গড়ে উঠেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর একটি সামাজিক সংগঠন 'জাতীয় আদিবাসী পরিষদ' সমতলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সমতলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলের মুণ্ডাদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনদিন। 'জাগকে উঠক মুণ্ডা' নামের একটি সংগঠন মুণ্ডাদের ঐক্যবদ্ধ করতে ও ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষায় ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[২৩] ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার উৎসাহ প্রদান এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে 'বাংলাদেশ মুণ্ডা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন'। এছাড়া তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো, প্রথাগত আইন, সুরক্ষা ও প্রসার এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার রক্ষায় সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে 'সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা' (সামস) গড়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে মুণ্ডাদের নানান সমস্যা যেমন: জমি রক্ষা করার লড়াই, বিশুদ্ধ পানির সমস্যা, আর্থিক সংকট, লবণাক্ততার মধ্যে কৃষি কাজ, দূর থেকে পানি সংগ্রহ করা, কর্মক্ষেত্র কমে যাওয়া, ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার লড়াই সহ অনেক সমস্যা রয়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে এই সংগঠনটি কাজ করছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বসবাস। সারাদেশ জুড়েই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে। আদমশুমারি, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, আয়-ব্যয় খানা জরিপ এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিবেদনের বিভিন্ন সামাজিক সূচকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের পিছিয়ে পড়ার তথ্য উঠে এসেছে। দেশের ক্ষুদ্র

নৃগোষ্ঠীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সুবিধাসহ নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এক দশকের বেশি সময় ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা খাতে বাংলাদেশের চমকপ্রদ অগ্রগতি হলেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে তা খুব একটা দৃশ্যমান নয়। তাদের মধ্যে দারিদ্র্যের হারও এখনো অনেক বেশি। বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে, তবে সেই উন্নয়নের ছোঁয়া কমই লেগেছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের ঘরে। তাদের উন্নয়নে বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মকাণ্ডের বাইরে সরকারের সমন্বিত কোনো কর্মসূচি নেই বললেই চলে। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস সমতলে। তাদেরই একটি সম্প্রদায় মুণ্ডা। মুণ্ডা সম্প্রদায় খুব সহজসরল প্রকৃতির ও দায়িত্বশীল নৃগোষ্ঠী। তাদের এই সরলতার সুযোগ নিয়ে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন উপায়ে তাদের ভূমিহীন কৃষকে পরিণত করে রেখেছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তারা অধিকাংশ দারিদ্র্যপীড়িত এবং সমাজের মূল স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। বাংলাদেশে আগমনের প্রায় দেড়শত বছর হতে চললেও তাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এখনো ভঙ্গুর আর নাজুক। হাজারো সমস্যাজর্জরিত হয়েও কিছু সংখ্যক মুণ্ডা তরুণ-তরুণী শিক্ষা ও সামাজিক সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরায় মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার কথা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে দেশের অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন অংশীদারদের ভূমিকা রাখতে হবে। তবেই মুণ্ডা নৃগোষ্ঠী তাদের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লাভ করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূচি:

---

১ মোহাম্মদ নাজিমুল হক, সম্পা., *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান* (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১৫), পৃ. ১০

২ স্বরোচিষ সরকার, সম্পা., *বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়* (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১৮), পৃ. ৩০৭

৩ তদেব, পৃ. ৩০৭

৪ নীপা চৌধুরী, *মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: আপন প্রকাশ, ২০২০), পৃ. ২১

৫ অশোক বিশ্বাস, *বুনো সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: আপন প্রকাশ, ২০১৯), পৃ. ১৩

৬ স্বরোচিষ সরকার, সম্পা., *বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়*, পৃ. ৩১৮

৭ মোহাম্মদ নাজিমুল হক, সম্পা., *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান*, পৃ. ১২২

৮ দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট ২০১৯

৯ তদেব

[১০] মেসবাহ কামাল, সম্পা., *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা ৩য় খণ্ড* (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ৩৮০
[১১] নীপা চৌধুরী, *মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৩২
[১২] দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট ২০১৯
[১৩] মুস্তাফা মজিদ, *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচয়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫), পৃ. ২০
[১৪] অশোক বিশ্বাস, *বুনো সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৬৮
[১৫] সালেক খোকন, *সমতলের বারো জাতি* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০২২), পৃ. ১২৮
[১৬] তদেব, পৃ. ১২৮
[১৭] তদেব, পৃ. ১২৮
[১৮] মুস্তাফা মজিদ, *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচয়*, পৃ. ২১
[১৯] স্বরোচিষ সরকার, সম্পা., *বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তার আত্মপরিচয়*, পৃ. ৩০৭
[২০] অশোক বিশ্বাস, *বুনো সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২০
[২১] দৈনিক সংগ্রাম, ১ মার্চ ২০২১
[২২] https://www.jagonews24.com/country/news/646359#, দেখা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
[২৩] দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট ২০১৯